দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... ৩০ JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

# এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাহালুল মজনুন চুন্নু

উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে উচ্চশিক্ষা- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাঙালীর আলোকস্তম্ভ, স্বর ও সুরের প্রতীক, জাতির বিবেক হিসেবে স্বীকৃত অদম্য অপরাজেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্পণ করল সাতানব্বই বছরে। সেই ১৯২১ সালের পহেলা জুলাই থেকে পথচলা এই বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সৃষ্টি করে চলছে একের পর এক অমরকাব্য। বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত এটি সেই বিরলতম বিশ্ববিদ্যালয়, যা একটি জাতির জন্মে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে যে মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, তার প্রধান প্রভাবক, প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস বিনির্মাণের গর্বিত প্রধান অংশীদার। সঙ্কটাপন্ন দিশেহারা বাঙালী জাতিকে পথ দেখানো, মুক্তির নেশায় উজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কেবল বিদ্যাচর্চাতেই থেমে থাকেনি এর কার্যক্রম, নেতৃত্ব দিয়েছে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। অন্যায়-অবিচারে হয়েছে প্রতিবাদমুখর। ভাষার, শিক্ষার, মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ে এবং সেই সঙ্গে গণমানুষের মাঝে মুক্তির চৈতন্য সৃষ্টিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় মহীরুহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বারংবার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ১৯২৩ সালের ১৭ আগস্টের সভায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটো বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ট্রুথ শ্যাল প্রিভেইল অর্থাৎ সত্যের জয় সুনিশ্চিত। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই অনির্বাণ শিখার মতো কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাই তো বাঙালী জাতির জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনার সত্যকে দেদীপ্যমান করে তাদেরকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে। পরিণত হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সামরিকতন্ত্র, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূতিকাগারে। এ কারণে বলা হয়, বাঙালী জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের যত প্রাপ্তি, তার প্রধান অংশীদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধি, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তা-চেতনার গভীরে শেকড় সঞ্চার করেই বিকশিত হয়েছে আমাদের জাতিসত্তা ও স্বাধিকার চেতনা। সেই ঐতিহ্য আজও বর্তমান। অবিশ্বাস্য প্রত্যয়ে দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে এবং প্রস্তুত করে চলছে দেশ পরিচালনার ভবিষ্যতের সারথীদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা।' এই সাধনাই বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিমনের সমন্বয় ঘটায় এবং নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে জাতিকে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য, অসাধারণ। বিদ্যার সাধনার মধ্যে দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে দক্ষ পেশাজীবী, সচেতন আলোকিত মানুষ তৈরি করছে, আর অন্যদিকে গবেষণার মধ্য দিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। এক্ষেত্রে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রয়েছে। প্রথমত কতকগুলো বৃত্তি বা পেশার জন্য পুরুষ ও নারীদেরকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা। দ্বিতীয়ত আশু কোন কিছু লাভের সম্ভাবনা সম্মুখে না রেখেও উচ্চস্তরের জ্ঞান অর্জনের ও গবেষণার সুযোগ দান করা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ...কম ছাত্রদের দেখতে চাই যারা কতিপয় পেশা ...ত্তির জন্য উচ্চ শিক্ষা চায়। এবং যাদের এ... ...শেষ যোগ্যতা আছে যার দ্বারা তারা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সমাজে মূল্যবান কিছু দিতে পারে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেশ সাফল্যের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে গিয়েছে। এবং পরিণত হয়েছে এদেশের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ, গবেষণাভিত্তিক অবকাঠামো আর মানব-সম্পদের প্রধান উৎসে।

চীনের বিপ্লবী নেতা মাও সেতুং বলেছিলেন, 'তুমি যদি এক বছরের জন্য কোন পরিকল্পনা কর তবে ধানের বীজ রোপণ করো, দশ বছরের জন্য হলে গাছ লাগাও আর সারা জীবনের জন্য হলে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করো।' বাঙালী সমাজে এই শিক্ষিত সচেতন মানুষ তৈরি করার প্রধান কারিগরই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের আঁতুরঘর এই বিশ্ববিদ্যালয়ই। এখানেই রোপিত হয়েছে জাতীয় সমৃদ্ধির শেকড়। ড. অমলেন্দু বসু তাঁর 'স্মৃতির ধূসর সরণিতে' লেখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিরন্তর অগ্রসরমান, এখানে ব্যক্তিত্বের সংযত বিকাশের অমূল্য সুযোগ, এখানে জ্ঞান পথিক যুবজনচিত্ত ক্রমেই এগিয়ে যায়, তার জীবনের মন্ত্র, উপনিষদের ভাষায় 'চরৈবেতি' এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো...'। সহসা বোধ করলাম যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি কতগুলো সুদৃশ্য ও বিশাল হর্মে বিচরণ করার জন্য নয়, এসেছি এক অন্তহীন আলোকিত মনোজগতে বিচরণ করার জন্য। সহসা যেন আমার অনভিজ্ঞ আদর্শ সন্ধানী তরুণ সত্তায় অনুভব করলাম একটা বিরাট দায়িত্ব। এই দায়িত্বের চেতনা এবং দায়িত্ব পালনের অনির্বাণ সন্তোষ, দুইয়ের উৎস ছিল আমাদের শিক্ষায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।' এই বিশ্ববিদ্যালয় এই কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি কখনও। দেশ ও সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতিতে বিভিন্ন অঙ্গনে অতীতে ভূমিকা রেখেছেন, বর্তমানেও রাখছেন এমন অনেক পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বেরই ছাত্রজীবন কেটেছে কলা ভবন, মধুর ক্যান্টিন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, হাকিম চত্বর, টিএসসি, সায়েন্স এ্যানেক্স ভবন ও কার্জন হলের সবুজ চত্বরে। এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বুদ্ধদেব বসু, মুনীর চৌধুরী, স্যার এ এফ রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ড. মকসুদুল আলমসহ অসংখ্য বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। সত্যেন বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনিবাস কৃষ্ণান, কাজী মোতাহার হোসেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, সরদার ফজলুল করিম, আনিসুজ্জামানের মতো অগণিত কৃতী সন্তানদের স্মৃতিধন্য এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকেই রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন দেশের অধিকাংশ প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেতানেত্রী। দেশের প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাখছেন কৃতিত্বের সাক্ষর। বিসিএসসহ অন্য সকল প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারা কর্মক্ষেত্রেও রাখছেন প্রতিভার স্বাক্ষর।

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মদক্ষ পেশাজীবী তৈরি করতে সক্ষম হলেও বর্তমানে গবেষণা ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় গবেষণার প্রজনন ক্ষেত্র। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনার বিকাশ প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়

মেধার সঙ্গেই হৃদবৃত্তির গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে পঠনপাঠন কার্যক্রম। ক্লাস ফাঁকি প্রায় অসম্ভব। সময়ে সিলেবাস শেষ করে নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা। কোন সেশনজট নেই, অনিয়ম নেই। আধুনিক পঠন-পাঠন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রেও দেয়া হয় সবিশেষ গুরুত্ব। শিক্ষার্থীদের দেশ ও সমাজ সচেতন হিসেবে যেভাবে গড়ে তোলা হয়, তেমনি গড়ে তোলা হয় ক্যারিয়ার সচেতন হিসেবেও। ফলে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিকভাবে এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেদের এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও কিছু র‌্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনের সারিতে রাখা হয়। এর মূল কারণ সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ না করা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বিবেচনা করা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিকভিত্তিতে চলে না। যদি এমন কোন র‌্যাংকিং করা হয় যে সবচেয়ে কম খরচে কোন বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পারছে, তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের মধ্যে সর্বশীর্ষে থাকবে।

তবে এটাও অস্বীকার করার জো নেই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মদক্ষ পেশাজীবী তৈরি করতে সক্ষম হলেও বর্তমানে গবেষণা ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় গবেষণার প্রজনন ক্ষেত্র। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনার বিকাশ প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এডওয়ার্ড শিলস তাঁর 'দি কলিং অব এডুকেশন' গ্রন্থে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মৌল কাজ হলো জ্ঞানের চর্চা এবং জ্ঞানকে নতুনভাবে উপলব্ধি করা, বিচার করা, পরিচর্যা করা। গবেষণা তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ। কারণ, এ ছাড়া জ্ঞানের মর্মে পৌঁছাবার কোন বিকল্প নেই।' এজন্য সূচনালগ্ন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উনপঞ্চাশটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। 'সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস' বা সিআরএস-এ বিদেশী গবেষকরাও ভিড় জমাচ্ছে। গত সাত বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ফিল ডিগ্রী ৬৫০ জন এবং পিএইচডি ডিগ্রী ৫৪৪ জন অর্জন করেছে। তবে তা কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় নয়। কিছু কিছু গবেষণাকেন্দ্রে তেমন কোন গবেষণা হয় না। মাঝে মাঝে সেমিনার আয়োজন করে কেবল নিজেদের উপস্থিতিই জানান দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এগুলোর কর্মকাণ্ড। এর কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের অভাব। প্রতি অর্থবছরে গবেষণা খাতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রস্তাব করা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তার অনেকাংশই কাটছাঁট করে ফেলে। যার কারণে গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে সেভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবেষণা খাতে বাজেটের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। স্নাতক শ্রেণীতে মৌলিক গবেষণার ওপর আলাদা বেসিক কোর্সও চালু করা হয়েছে অনেক বিভাগে, যা শিক্ষার্থীদের মৌলিক গবেষণা উদ্বুদ্ধ করবে। তাছাড়া তরুণদের উদ্ভাবনী চিন্তা বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠন করেছে 'ইনোভেশন এ্যান্ড ইনকিউবেশন ল্যাব' তথা উদ্ভাবন ও পরিচর্যা পরীক্ষাগার। এখানে শিক্ষার্থীরা যেমন নিজেদের নতুন নতুন ধারণা, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়িক কিংবা অন্য যে কোন সৃজনশীল আইডিয়া উপস্থাপন করতে পারবেন, তেমন পারবেন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ভেতরে বাইরে জমকালো এক ব্যাপার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিখিল বাংলার একমাত্র উদ্যান নগরে পনেরো-কুড়িটি অট্টালিকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে তার কলেজ বাড়ি, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস। ফাঁকে ফাঁকে সবুজ বিস্তীর্ণ মাঠ। ইংল্যান্ডের দেশীয় পল্লী কুটিরের মতো ঢালু ছাদের এক একটি দোতলা বাড়ি- নয়নহরণ, বাগানসম্পন্ন। সেখানে কর্মস্থলের অতি সন্নিকটে বাস করেন আমাদের প্রধান অধ্যাপকরা। অন্যদের জন্যও নীলক্ষেতে ব্যবস্থা অতি সুন্দর। স্থাপত্যে কোন একঘেয়েমি নেই, সরণি ও উদ্যান রচনায় নয়াদিল্লীর জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি। বিজ্ঞান ভবনগুলো আরক্তিম ও তুর্কি শৈলিতে অলংকৃত।' এটা স্বীকার্য যে এমন দৃশ্যপট এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভাগ, ইনস্টিটিউট, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, হল, আবাসিক ভবনের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন তেমন বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ পাওয়া যায় না। দোতলা বাড়ির পরিবর্তে এখন বহুতল ভবনের ছড়াছড়ি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য একের পর এক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সাম্প্রতিক সময়ে বিজয় '৭১ হল, সুফিয়া কামাল হল, বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, মুনীর চৌধুরী টাওয়ার, শেখ রাসেল টাওয়ার, সাতই মার্চ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মহান ব্রত নিয়ে অপরাজেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়ন করে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। সেই সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যতও।

লেখক : সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য
ঢাকা বিশ্ববি...